তিন.

বঙ্গবন্ধুর জীবনে চার দিশারী

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টজন সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। যে ক'জন তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, তাঁর রাজনীতির দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (বঙ্গবন্ধুর 'মানিক ভাই')-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* আলোকে নিম্নে বঙ্গবন্ধুর জীবনে তাঁদের প্রভাব বা ভূমিকা তুলে ধরা হলো।

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (১৯৩০-১৯৭৫)

প্রথমেই আসে তাঁর সহধর্মিণী রেণু'র (বেগম ফজিলাতুন্নেছা) কথা। বঙ্গবন্ধুর বাল্যকালে বাবা-মা হারানো চাচাতো বোন রেণু'র সঙ্গে তাঁর অতি ছোট বেলায় বিবাহ হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, তিনি (রেণু) ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত, দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল। বঙ্গবন্ধুর জীবনে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। এতদিন বিভিন্ন সূত্রে তা জানা গেলেও, এখন বঙ্গবন্ধুর নিজের কথা থেকে বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অজানা তথ্য জানা গেছে। বঙ্গবন্ধুর *আত্মজীবনী* লেখার পেছনেও মূল প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁরই। এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন:

> আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, "বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, "লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়!" "...আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না ... আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেণু—আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১)।

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময় কারাগারে বন্দি থাকাকালে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের পার্টির কর্মীদের খোঁজখবর নেওয়া, দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সংসারের খরচের টাকা থেকে

সঞ্চয় করে তা কর্মীদের দেওয়া, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯৬৮-৬৯) বিচারাধীন থাকাকালীন নিঃশর্ত মুক্তি ছাড়া প্যারোলে মুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন না করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর নিকট খবর পাঠানো, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের এসব ভূমিকা সম্বন্ধে জনশ্রুতি ও কিছু লেখালেখি রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ থেকে বুঝা যায়, এর সবই ছিল সত্যি।

বঙ্গবন্ধু *আত্মজীবনী*তে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে নানা ঘটনা তুলে ধরেছেন (পৃ. ৭২, ১২৬, ১৪৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৯১, ২০৫, ২০৭, ২১০, ২১১, ২৬২, ২৭০, ২৭১, ২৮৫)। এসবের মধ্যে, বঙ্গবন্ধুকে চলার জন্য টাকা জোগাড় করে গোপনে তা তাঁকে দেওয়া, সম্মেলনের অতিথিদের খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য টুঙ্গিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ আসা, বঙ্গবন্ধুর বিএ পরীক্ষার সময় উৎসাহ যোগান ও যত্ন নিতে কলকাতা ছুটে আসা, ঢাকায় অতি কষ্টে বাড়ি ভাড়া করে থাকা, বঙ্গবন্ধু বন্দি থাকা অবস্থায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানোসহ সংসারের হাল ধরা, বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তাঁর প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় ও অন্য জিনিসপত্র স্যুটকেসে প্রস্তুত করে দেওয়া ইত্যাদি রয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর *আত্মজীবনী*তে লিখেছেন, "রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকাপয়সা জোগাড় করে রাখত যাতে আমার কষ্ট না হয়" (পৃ. ১২৬)। আর এক জায়গায় লিখেছেন, "সে [রেণু] তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলে না বা বলতে চায় না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে" (পৃ. ১৪৬)।

একবার একনাগাড়ে ১৭-১৮ মাস বঙ্গবন্ধু জেলে কাটান। এক জেল থেকে অন্য জেলে। মামলায় হাজিরা দিতে বঙ্গবন্ধুর গোপালগঞ্জে আসা। জেলের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। অবশেষে জামিনে মুক্তি দেয়া হলেও, পরক্ষণে নিরাপত্তা আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। গোপালগঞ্জ থানায় বসে স্ত্রী রেণু বঙ্গবন্ধুকে একাকী পেয়ে যে-কথাগুলো বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তা তাঁর *আত্মজীবনী*তে এভাবে লিপিবদ্ধ করেন:

> রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, "জেলে থাক আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন ... তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে?" ... আমি বললাম "খোদা যা করে তাই হবে, চিন্তা করে লাভ কি?" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯১)।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের সময় ফরিদপুর জেলে বন্দি অবস্থায় (১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তরিত হন) বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন আহমেদ ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৬-২৭ মাস বিনাবিচারে কারাগারে বন্দি। দীর্ঘ কারাভোগের কারণে বঙ্গবন্ধুর শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ে। হার্টের অবস্থাও খারাপ। বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, অনশনেই মৃত্যু ঘটবে। তাই তিনি অনশন

শুরুর পূর্বে চিরকুটে চারখানা চিঠি লিখেন। এর একখানা ছিল স্ত্রী রেণুর উদ্দেশে। ১২ দিন অনশন করার পর ২৭শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পেয়ে বাড়ি পৌঁছার পর রেণু বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে যা বলেন, বঙ্গবন্ধু তা এভাবে লিপিবদ্ধ করেন:

> তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম ... রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কি উপায় হত? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কি হত? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হত না? মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কিভাবে করতা?" আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, "উপায় ছিল না" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২০৭)।

বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, রাজনীতি-সচেতন এক মহিয়সী নারী; বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের আজীবন সাথী।

শেখ লুৎফর রহমান (১৮৮১-১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবারের অপর সদস্য হলেন শেখ লুৎফর রহমান। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদান সম্পর্কে পূর্বে বিভিন্ন সূত্রে কমবেশি জানা গেলেও, শেখ লুৎফর রহমানের ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্বে বঙ্গবন্ধুর *আত্মজীবনী* গ্রন্থের মত করে আর জানা যায়নি। শেখ লুৎফর রহমান শুধু বঙ্গবন্ধুর জন্মদাতা ছিলেন না, বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনে তিনি তাঁর একজন পথনির্দেশকও ছিলেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল যেমনি ঘনিষ্ঠ, তেমনি স্নেহ-মমতায় ভরা।

তাঁদের গোপালগঞ্জের বাসায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রিকা রাখা হতো। বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা থেকেই তা পড়তেন। উভয়ে গভীর রাত পর্যন্ত রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতেন এবং কখনো পরামর্শ দিতেন। যেমন, ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জিন্নাহর সঙ্গে নীতিগত প্রশ্নে মতভেদের কারণে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে সকল সংশ্লিষ্টতা ছিন্ন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ বিরোধী অন্যান্য দল নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩) গঠন করেছিলেন। মুসলিম লীগ ও এর ছাত্র সংগঠন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে হক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে। বঙ্গবন্ধুও আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। মুসলমান সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তোলার

জন্য তারা হক সাহেবের নতুন এ মন্ত্রিসভাকে 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' নামে আখ্যায়িত করেন। তবে হক সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছু না বলার জন্য বঙ্গবন্ধুর বাবা ও মা তাঁকে একদিন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু সে সম্বন্ধে লিখেন:

> একদিনের কথা মনে আছে, আব্বা ও আমি রাত দুইটা পর্যন্ত রাজনীতির আলোচনা করি। আব্বা আমার আলোচনা শুনে খুশি হলেন। শুধু বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ না করতে। একদিন আমার মা'ও আমাকে বলছিলেন, "বাবা যাহাই কর, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলিও না" (পৃ. ২২)।

ফজলুল হক বাংলার কৃষকদের কাছে কিংবদন্তিতুল্য জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রথম সরকারের সময় (১৯৩৭-১৯৪১) ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের (বইয়ে শেরে বাংলা সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে তিনি কৃষককুলের জন্য যা করেছেন, আজও সে জন্য তারা গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁকে স্মরণ করে। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি যে লাহোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে উত্থাপিত, শেরে বাংলা ছিলেন তার প্রস্তাবক। পাকিস্তান আন্দোলনের স্রোতে তাঁর এক সময়কার কৃষক-প্রজা পার্টি ভেসে যায় বটে, তবে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ন থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির চার সিটের মধ্যে তাঁর দুই সিটের উভয়টিতে জয়লাভ করা ছিল এরই প্রমাণ। তাই, বঙ্গবন্ধুর বাবা ও মা তাঁকে শেরে বাংলা সম্পর্কে যে উপদেশ পরামর্শ দিয়েছিলেন তা যে কত সত্য ছিল, বঙ্গবন্ধুর *আত্মজীবনী*তে তাঁর নিজের বর্ণনা থেকে বিস্তারিত জানা যায়। শেরে বাংলার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কীভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন (বইয়ে শেরে বাংলা সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য), সে কথা বইয়ে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '... আমি অন্যভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। সোজাসুজিভাবে আর হক সাহেবকে দোষ দিতে চেষ্টা করলাম না' (পৃ. ২২)।

বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক কর্মে তাঁর পিতা সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন। উভয়েই একমত ছিলেন যে, পাকিস্তান অর্জন ব্যতীত বাঙালি ও ভারতের মুসলমানদের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপায় নেই। তাদের গোপালগঞ্জের বাড়িতেই ছিল বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের স্থানীয় শাখা অফিস। অনেক সময় দলের স্থানীয় সভা বা পাকিস্তান বিষয়ক সম্মেলনে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা, খাবার ও অন্যান্য খরচের অধিকাংশ তাঁর পিতা বহন করতেন। প্রায়শ বঙ্গবন্ধুর চলার জন্য তিনি নিজের চাকরি ও সম্পত্তির আয় থেকে তাঁকে টাকা দিতেন। বঙ্গবন্ধু অনেক সময় এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে তিনি সেখানে ছুটে যেতেন (বিস্তারিত, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১০, ১৯-২২, ৬১, ৮৬, ১৬৪, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৯, ২০৬, ২১০, ২৮৫)।

তবে, বঙ্গবন্ধুর লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই অনড়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর আব্বা একবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

> বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না।

> আর একটা কথা মনে রেখ, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২১)।

বাবার এ উপদেশ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু লিখেন, 'এ কথা কোনোদিন আমি ভুলি নাই' (পৃ. ২১)। একদা গোপালগঞ্জ শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি মুজিব 'যা আরম্ভ করেছে তাতে তার জেল খাটতে হবে, তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে এখনই বাধা দেন'—এরূপ কথা শেখ লুৎফর রহমানকে বললে, প্রত্যুত্তরে তিনি (লুৎফর রহমান) যা বলেছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য:

> দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না (পৃ. ২১-২২)।

বিএ পাসের আগে কলেজের বাকি মাহিনা পরিশোধ ও নতুন জামাকাপড় ক্রয় বাবদ বঙ্গবন্ধু তাঁর আব্বার কাছে টাকা আনতে গেলে তাঁর হাতে টাকা দিয়ে যা বলেছিলেন, তাও স্মরণযোগ্য:

> কোনো কিছুই শুনতে চাই না। বিএ পাস ভালভাবে করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ, 'পাকিস্তানের আন্দোলন' বলে কিছুই বলি নাই। এখন কিছুদিন লেখাপড়া কর (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৬১)।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

যে নেতার সান্নিধ্যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে এবং যিনি ছিলেন তাঁর রাজনীতির আদর্শিক গুরু, তিনি হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বাংলার অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন এক পরিবারে তাঁর জন্ম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (অনার্স) ও বিসিএল ডিগ্রি অর্জন এবং লন্ডনের গ্রেজ্‌স ইন থেকে ব্যারিস্টার-এট-ল পাস করে দেশে ফিরে আসার পর পর শুরু হয় তাঁর চার দশকব্যাপী বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতা থেকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, তখন তিনি ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর তিনি প্রথমে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১) ও পরে খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী (১৯৫৪-১৯৫৫) ও প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭) হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলায় মুসলিম লীগের মূল সংগঠক ও পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম কারিগর। পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম বিরোধী দল সৃষ্টির মূল প্রেরণাও ছিল তাঁর। বঙ্গবন্ধুর *আত্মজীবনী*র পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে সোহরাওয়ার্দীর কথা উল্লেখ রয়েছে এবং সেটিই স্বাভাবিক।

১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জে জনসভা উপলক্ষে মিশন স্কুল পরিদর্শন করতে এলে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রথম পরিচয় ঘটে। সোহরাওয়ার্দী তখন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী। আর বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। এই যে পারস্পরিক সম্পর্কের শুরু, তাতে কোন দিন ছেদ ঘটেনি। বরং দিনে দিনে তা ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও পরবর্তী যোগাযোগ সম্বন্ধে *আত্মজীবনী*তে লিখেন:

> তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারি কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, "তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?" বললাম, "কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।" তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১১)।

সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর নিজ সন্তানের মত স্নেহ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখতেন। ১৯৪৯ সালে ভীষণ শীতের সময় বঙ্গবন্ধু হুলিয়া মাথায় নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতে পাকিস্তানের লাহোরে যান। তখন পকেটে ছিল মাত্র দু'টাকা। হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দী কিভাবে তাকে শীতবস্ত্র কিনে দিয়েছিলেন, সে স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু *আত্মজীবনী*তে লিখেন:

> শহীদ সাহেব আমাকে নিয়ে দোকানে গেলেন ... তিনি নিজের কাপড় বানানোর হুকুম দিয়ে একটা ভাল কম্বল, একটা গরম সোয়েটার, কিছু মোজা ও মাফলার কিনে নিলেন এবং বললেন, কোনো কাপড় লাগবে কি না! আমি জানি শহীদ সাহেবের অবস্থা। বললাম, না আমার কিছু লাগবে না। তিনি আমাকে যখন গাড়িতে নিয়ে হোটেলে পৌছাতে আসলেন, জিনিসগুলি দিয়ে বললেন, "এগুলি তোমার জন্য কিনেছি। আরও কিছু দরকার হলে আমাকে বোলো।" গরম ফুলহাতার সোয়েটার ও কম্বলটা পেয়ে আমার জানটা বাঁচল। কারণ, শীতে আমার অবস্থা কাহিল হতে চলেছিল (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৩৭-৩৮)।

সোহরাওয়ার্দী যে বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে ভালবাসতেন তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৪ সালের নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কমিটি গঠন নিয়ে এক ঘটনায়। এ ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে প্রথমে মতভেদ ও কথা কাটাকাটির পর বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর বাসায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সমঝোতা বৈঠক থেকে বের হয়ে যান।

সোহরাওয়ার্দী সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাসায় ফিরিয়ে এনে যে কথা বলছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু সে দিনের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে তাঁর ডায়েরিতে যা লিখেন, তাতে দু'জনের মধ্যকার আজীবন পারস্পরিক স্নেহ, মমতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর কথায়:

> হুদা ভাই [মাহমুদ নূরুল হুদা] দৌড়ে এসে আমাকে ধরে ফেললেন। শহীদ সাহেবও দোতালা থেকে আমাকে ডাকছেন ফিরে আসতে ... উপরে এলাম। শহীদ সাহেব বললেন, "যাও তোমরা ইলেকশন কর, দেখ নিজেদের মধ্যে গোলমাল কর না।" আমাকে আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই একথা বলি নাই, তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলে তোমাকেই বলেছি।" আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি যে সত্যিই আমাকে ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত। যখনই তাঁর কথা এই কারাগারে বসে ভাবি, সেকথা আজও মনে পড়ে। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরেও একটুও এদিক ওদিক হয় নাই। সেইদিন থেকে আমার জীবনে প্রত্যেকটা দিনই তাঁর স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘদিন আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে নাই এবং তাঁর স্নেহ থেকে কেউই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে নাই (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৯)।[১]

এ থেকে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুও নেতার প্রতি ছিলেন গভীরভাবে অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল। দিনে কর্মব্যস্ত থাকায় সোহরাওয়ার্দী গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর কলকাতার বাসায় যেতে বলতেন এবং রাজনীতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা আলোচনা করতেন। উভয়ে ছিলেন দক্ষ সংগঠক, অসীম সাহসী, দেশ ও জনগণের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকৃত ও নিবেদিতপ্রাণ।

সোহরাওয়ার্দীর মন ছিল উদার ও প্রশস্ত এবং সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। পারিবারিক ঐতিহ্য আর বিলেতে উচ্চ শিক্ষা লাভের কারণে তাঁর মধ্যে এসব গুণ জন্ম নেয়। তিনি ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থ এবং দলীয় স্বার্থের চেয়ে দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থকে সব সময় বড় করে দেখতেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বহু ঘটনায় এর প্রমাণ মিলে। আত্মবিশ্বাস, কর্মদক্ষতা ও সাংগঠনিক শক্তি ছিল রাজনীতিতে তাঁর প্রধান অবলম্বন। বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের এ বিষয় সম্বন্ধে বলেন:

> শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৪৭)।

বঙ্গবন্ধুও নেতার এসব গুণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নিজ জীবনে তা অনুসরণ করে চলেন। তবে অতিশয় উদারতা যে অমঙ্গলজনকই বেশি হয়, সোহরাওয়ার্দীর জীবন থেকে সে শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন এবং সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন।

যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা ব্যতীত পাকিস্তান আদৌ প্রতিষ্ঠা হতো কিনা সন্দেহ, সেই সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুর দিকে বহিষ্কার করে ভারতে যেতে

বাধ্য করা, পাকিস্তান গণপরিষদ থেকে তাঁর সদস্যপদ বাতিলসহ তাঁর ওপর নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক নির্যাতন-নিপীড়ন এবং টাকার অভাবে তাঁর বিদেশে চিকিৎসা করতে যেতে না পারার দৃশ্য বঙ্গবন্ধুকে খুবই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর *আত্মজীবনী*তে লিখেন:

> "শহীদ সাহেবের নাম শুনলে লোকে শ্রদ্ধা করত, তাঁর নেতৃত্বে বাংলার লোক পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। যাঁর একটা ইঙ্গিতে হাজার হাজার লোক জীবন দিতে দ্বিধাবোধ করত না, আজ তাঁর কিছুই নাই। মামলা না করলে তাঁর খাওয়ার পয়সা জুটছে না। কত অসহায় তিনি! তাঁর সহকর্মীরা...আজ তাঁকে শত্রু ভাবছে।" এরপর বঙ্গবন্ধু লিখেন, "তিনি নীরবে অত্যাচার সহ্য করবেন না, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবেন" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৪৩-৪৪)।

সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৩৫) ঢাকায় ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। আওয়ামী লীগকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু একসঙ্গে সমগ্র পূর্ব বাংলা ঘুরে ঘুরে সভা করেছেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের তিনিই (সোহরাওয়ার্দী) ছিলেন মূল কারিগর। দেশ, জাতি, মানুষের জন্য আজীবন নিঃস্বার্থ রাজনীতি করা সত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব বাদ দিলে তিনি মাত্র ১৬ মাস (১৯৪৬-১৯৪৭) অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং ১৩ মাস (১৯৫৬-১৯৫৭) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেল কক্ষে নির্জনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে সোহরাওয়ার্দীর প্রভাব এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক কত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল, তা দুটো ঘটনায় স্পষ্ট হয়। একটি, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন পূর্বে বঙ্গবন্ধু আমরণ অনশন শুরুর প্রাক্কালে চিরকুট আকারে যে ৪টি পত্র তিনি লিখেছিলেন, এর একটি ছিল সোহরাওয়ার্দীর উদ্দেশে। অপরটি, বঙ্গবন্ধুর *আত্মজীবনী* লেখার ক্ষেত্রে যাঁর স্মৃতি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়:

> একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল। কেমন করে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল লিখতে ভাল না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি? ... তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১)।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯)

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের বছর পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়ায় তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়ার জন্ম। তিনি ছিলেন একইসঙ্গে সাংবাদিক ও রাজনীতির তাত্ত্বিক। তিনি *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। '৬০-এর দশকে মোসাফির ছদ্মনামে *ইত্তেফাকে* 'রাজনৈতিক হালচাল', 'রঙ্গমঞ্চে' ও 'মঞ্চে নেপথ্যে' উপসম্পাদকীয় কলাম লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

শিক্ষা শেষে কিছুদিনের জন্য জেলা পর্যায়ে সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে চাকরিতে নিয়োজিত হন বটে, তবে শীঘ্রই তিনি বাংলার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন এবং চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যান (১৯৪৩)। সেখানে তিনি সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিসে সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। সোহরাওয়ার্দী তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

আইয়ুবের শাসনকালে (১৯৫৮-১৯৬৯) তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া অসাম্প্রদায়িক আদর্শ, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য, পূর্ব বাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সাংবিধানিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বাঁচার দাবি' ৬-দফা কর্মসূচি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৬৮-৬৯)-বিরোধী বাঙালির জাতীয় জাগরণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ক্ষুরধার লিখনির মাধ্যমে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে তাঁকে তিন বার (১৯৫৯, ১৯৬২ ও ১৯৬৬) কারাবরণ করতে হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু জেল-জুলুম-নিপীড়ন কোন কিছুই তাঁর আদর্শ থেকে তাঁকে সামান্যতম বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি ছিলেন অকুতোভয়, নির্ভিক। ষাটের দশকের শুরুর দিকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরোধিতা উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল চত্বরে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যে সময়ে (১৯৪৩ সালে) বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি নিযুক্ত হন, এর অল্প কিছু পূর্বে (১৯৪২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। উভয়ই ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর ঘোর সমর্থক। সে সময়েই তাঁদের প্রথম পরিচয়। সেই যে শুরু, আমৃত্যু সে সম্পর্ক শুধু টিকেই থাকেনি, ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। মানিক মিয়া বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে 'মানিক ভাই' বলে সম্বোধন করতেন। সহোদর না হলেও পরস্পরের মধ্যে যেন তেমন একটি সম্পর্ক-সম্বন্ধ গড়ে ওঠেছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, আস্থা আর একই রাজনৈতিক লক্ষ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর এ সম্পর্কের ভিত রচিত ছিল।

*আত্মজীবনী*র বহু স্থানে (পৃ. ৭৫, ৮৮, ১৬৬, ১৭৪-৭৫, ২১০, ২১৯, ২২১-২২২, ২২৬, ২২৯-৩০, ২৩৭, ২৫১-৫২, ২৬২-৬৩, ২৮১, ২৮৭) নানা প্রসঙ্গে মানিক মিয়া সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মানিক মিয়ার কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসা, তাঁর তত্ত্বাবধায়নে কলকাতা থেকে প্রকাশিত (১৯৪৭) সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকার পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কাজ করা, ১৯৪৮ সালের ৭ই জুলাই পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত সিলেট গণভোটে মানিক

মিয়া ও অন্যরাসহ বঙ্গবন্ধুর একই টিমে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন, মানিক মিয়ার করাচিতে উচ্চপদস্থ চাকরি লাভ এবং বঙ্গবন্ধুর কথায় শেষ পর্যন্ত ঐ চাকরিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত, আওয়ামী লীগ সংগঠনের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মানিক মিয়ার পত্রযোগাযোগ ও তাগিদ প্রদান, মানিক মিয়ার *ইত্তেফাক* পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ, এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও আওয়ামী লীগের মুখপাত্রে পরিণত হওয়া, মাও সে তুং-এর গণচীনে বঙ্গবন্ধু, মানিক মিয়া ও অন্যদের একসঙ্গে শান্তি সম্মেলনে যোগদান এবং এ উপলক্ষে নানা অভিজ্ঞতা, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুকে সম্মত করতে মানিক মিয়ার ভূমিকা, বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানিক মিয়ার পরামর্শ প্রদান ও ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

ইত্তেহাদ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় বঙ্গবন্ধুর ঐ সময়ে যে আর্থিক সহায়তা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি লিখেন:

> মানিক ভাই তখন কলকাতায় *ইত্তেহাদ* কাগজের সেক্রেটারি ছিলেন। আমাদের টাকা পয়সার খুবই প্রয়োজন। কে দিবে? বাড়ি থেকে নিজেদের লেখাপড়ার খরচটা কোনোমতে আনতে পারি, কিন্তু রাজনীতি করার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? আমার একটু স্বচ্ছল অবস্থা ছিল, কারণ আমি *ইত্তেহাদ* কাগজের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলাম। মাসে প্রায় তিনশত টাকা পেতাম (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৮৮)।

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় দু'মাস পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন এবং প্রগতিশীল মুসলিম লীগ কর্মীদের ঠিকানা হিসেবে পরিচিত ১৫০ নম্বর মোগলটুলী পার্টি হাউজে ওঠেন। শুরুর দিকে বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েক বছর সেখানে থাকেন। অপরদিকে, মানিক মিয়া বঙ্গবন্ধুরও বেশ কিছু পরে ঢাকায় আসেন। নতুন শহর ঢাকা। শুরুর দিকে এ শহরে থাকা-খাওয়াসহ নানা অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তাই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিজ এলাকা পিরোজপুরে রেখে মানিক মিয়া একা মোগলটুলীতে এসে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু লিখেন, 'মানিক ভাই ঢাকা এসে পৌঁছেছেন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। তিনিও এসে মোগলটুলীতে উঠেছেন' (পৃ. ১২৯)। তিনি বইয়ে পুনরায় লিখেন, 'মানিক ভাই মোগলটুলীতেই আছেন, কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না' (পৃ. ১৬৬)। এমনকি এ সময়ে মানিক মিয়া সাংবাদিকতা ছেড়ে চাকরি করার কথা ভাবতে থাকেন এবং করাচিতে একটি উচ্চ পদে চাকরিও পেয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐ চাকরিতে যোগদান করা হলো না। সমগ্র বিষয়টি বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন:

> একদিন ভাসানী সাহেব ও আমি কোর্টে যেয়ে দেখি মানিক ভাই দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের সাথে দেখা করার জন্য। আলাপ-আলোচনা হওয়ার পরে মানিক ভাই বললেন, "নানা অসুবিধায় আছি, আমাদের দিকে খেয়াল করার কেউই নাই। আমি কি আর করতে পারব, একটা বড় চাকরি পেয়েছি করাচিতে চলে যেতে চাই, আপনারা কি বলেন।" আমি বললাম, "মানিক ভাই, আপনিও আমাদের জেলে রেখে চলে যাবেন? আমাদের দেখবারও কেউ বোধহয় থাকবে না।" এরপর বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য, "আমি জানতাম মানিক ভাই চারটা ছেলেমেয়ে নিয়ে খুবই অসুবিধায় আছেন। ছেলেমেয়েদের পিরোজপুর রেখে তিনি একলাই ঢাকায় আছেন। মানিক ভাই কিছু সময় চুপ করে থেকে আমাদের বললেন, "না, যাব না আপনাদের জেলে রেখে" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৭৪-৭৫)।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খানের আর্থিক সহায়তায় মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। একই বছর মানিক মিয়া নিজেকে ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯৫১ সালে তিনি এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে এটি আবির্ভূত হয়। মানিক মিয়ার দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বে সাপ্তাহিক হিসেবেই *ইত্তেফাক* দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৯, ২৩৭)। প্রথম দিকে *ইত্তেফাক* প্রকাশে চরম আর্থিক সংকট, তা কাটিয়ে উঠতে বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়ার যৌথ প্রচেষ্টা, মানিক মিয়ার সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনায় কিভাবে পত্রিকাটি দাঁড়ায়, বঙ্গবন্ধু তাঁর গ্রন্থে এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এভাবে তুলে ধরেন:

> মওলানা সাহেব সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* কাগজ বের করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ বের হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ টাকা কোথায়? মানিক ভাইকে বললেন, কাগজটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, যদি পার তুমিই চালাও। মানিক ভাই বললেন, কি করে চলবে, টাকা কোথায়, তবুও চেষ্টা করে দেখব। আমি মানিক ভাইকে আমার এক বন্ধু কর্মচারীর কথা বললাম, ভদ্রলোক আমাকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। কলকাতায় চাকরি করতেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের বাসিন্দা নন তবুও বাংলাদেশকে ও তার জনগণকে তিনি ভালবাসতেন। আমার কথা বললে কিছু সাহায্য করতেও পারেন। মানিক ভাই পরের মামলার তারিখে বললেন যে, কাগজ তিনি চালাবেন। কাগজ বের করলেন। অনেক জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল। নিজেরও যা কিছু ছিল এই কাগজের জন্যই ব্যয় করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে কাগজটা খুব জনপ্রিয় হতে লাগল। ... সমস্ত জেলায় জেলায় কর্মীরা কাগজটা চালাতে শুরু করল। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের কাগজ হিসাবে জনগণ একে ধরে নিল। মানিক ভাই ইংরেজি লিখতে ভালবাসতেন, বাংলা লিখতে চাইতেন না। সেই মানিক ভাই বাংলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলামিস্টে পরিণত হলেন। চমৎকার লিখতে শুরু করলেন। নিজেই *ইত্তেফাকের* সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে ছাত্রলীগের দুই-তিনজন কর্মী সাহায্য করত। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার বন্ধুই তাঁকে বেশি সাহায্য করতেন। বিজ্ঞাপন পাওয়া কষ্টকর ছিল, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য কোথায়? আর সরকারি বিজ্ঞাপন তো আওয়ামী লীগের কাগজে দিত না। তবুও মানিক ভাই কাগজটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন একমাত্র তাঁর নিজের চেষ্টায় (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৭৫)।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি আওয়ামী লীগের কোন সদস্যও ছিলেন না। অথচ সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর উৎকণ্ঠা, সংশ্লিষ্টতা এতটুকু কম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘ কারাভোগ আর পরিশেষে ১২ দিনের অনশনের

পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করে গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে কিছুদিন থাকেন। তখন হার্টের সমস্যাসহ নানা অসুস্থতায় তিনি ভুগছিলেন। অপরদিকে, ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। অনেকে বন্দি হয়। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এমনি এক অবস্থায় মানিক মিয়া সংগঠনের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় আসার জন্য তাগিদ দিয়ে পত্র লিখেন। এমনকি ঢাকায় বসে চিকিৎসা নেওয়ার কথাও বলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বইয়ে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন:

> মার্চ মাস [১৯৫২] পুরাটাই আমাকে বাড়িতে থাকতে হল। শরীরটা একটু ভাল হয়েছে, কিন্তু হার্টের দুর্বলতা আছে। আব্বা আমাকে ছাড়তে চান না। ডাক্তারও আপত্তি করে। রেণুর ভয় ঢাকায় গেলে আমি চুপ করে থাকব না, তাই আবার গ্রেফতার করতে পারে।... নেতারা ও কর্মীরা সকলেই জেলে। সংগ্রাম পরিষদের নেতারা গোপনে সভা করতে যেয়ে সকলে একসাথে গ্রেফতার হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা অনেকেই জেলে বন্দি। আওয়ামী লীগের কাজ একেবারে বন্ধ। কেউ সাহস করে কথা বলছে না। লীগ সরকার অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে। ... এই সময় মানিক ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে অতিসত্বর ঢাকায় যেতে লিখেছেন। চিকিৎসা ঢাকায়ই করা যাবে এবং ঢাকায় বসে থাকলেও কাজ হবে। আমি আব্বাকে চিঠিটা দেখালাম। আব্বা চুপ করে থাকলেন কিছু সময়। তারপর বললেন, যেতে চাও যেতে পার। রেণুও কোনো আপত্তি করল না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২১০)।

আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানিক মিয়ার পরামর্শ থাকতই, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি বসে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিত। এটি বলা যায়, দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। যেমন, নীতিগত বিরোধ দেখা দেওয়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সংক্রান্ত দলের সিনিয়র নেতাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মানিক মিয়া তাতে উপস্থিত ছিলেন এবং সে বৈঠকে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর *আত্মজীবনী*তে এ বিষয়ে লিখেন:

> আমি [করাচি থেকে] ঢাকায় ফিরে এসে আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক ভাইকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম এবং সকল কথা তাঁদের বললাম। শহীদ সাহেবের মতামতও জানালাম। ভাসানী সাহেব কলকাতা এসে পৌঁছেছেন খবর পেয়েছি ... অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম। হক সাহেবের নেতৃত্বে অনাস্থা দেওয়া হবে কি হবে না, এ বিষয়ে ... তিনজনই প্রথমে একটু একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। অনাস্থা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নাই, তবে পারা যাবে কি যাবে না এ প্রশ্ন তুলেছিলেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৮৭-৮৮)।

আওয়ামী লীগ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ওপর মানিক মিয়ার ব্যক্তিগত প্রভাব বা এক ধরনের অভিভাবকত্ব যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বিভিন্ন ঘটনায় তা প্রকাশ পায়। যেমন, ১৯৫৪

সালের নির্বাচনে সরকারি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্য নিয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টিসহ কিছু দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সম্মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। প্রথম দিকে নীতিগত প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর এ ব্যাপারে সম্মতি ছিল না। কিন্তু দলের অন্য নেতাদের কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে বঙ্গবন্ধু সাংগঠনিক কাজে ঢাকার বাইরে অবস্থানকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী মানিক মিয়া ও আতাউর রহমান খানের পরামর্শে যুক্তফ্রন্ট গঠন সংক্রান্ত কাগজে দস্তখত করেন। এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও ভাসানীর মধ্যে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝিও হয়। মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুর নিকট এ সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, বঙ্গবন্ধুর বর্ণনায় তা ছিল এরূপ:

> আমি মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, "দেখ মুজিব, আমি যুক্তফ্রন্টে দস্তখত করতে আপত্তি করেছিলাম তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত; আতাউর রহমান ও মানিককে আমি বললাম যে, মুজিব সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের, তার সাথে পরামর্শ না করে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আতাউর রহমান ও মানিক বলল যে, তারা দুইজনে তোমার দায়িত্ব নিল। আমরা যা করব, মুজিব তা মেনে নেবে। তাই হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে আমাকে অনুরোধ করলেন, তখন আমি দস্তখত করতে বাধ্য হলাম।" এর পর বঙ্গবন্ধু লিখেন, "... কোন পন্থায় নমিনেশন হবে? কিভাবে কাজ চলবে? দায়িত্ব কে নিবে এই নির্বাচনের, কিছুই ঠিক না করে ঘোষণা করে দিলেন ... যা করেছেন ভালই করেছেন ... আর যখন আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই আমার ভার নিয়েছেন দাবি করে, তখন তাদের কথা আমি ফেলি বা কেমন করে!" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫১-৫২)।

অনুরূপভাবে শেরে বাংলার নেতৃত্বে প্রথম যখন ৪-সদস্য বিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয় (৩রা এপ্রিল ১৯৫৪), তখন আওয়ামী লীগের কোন প্রতিনিধিকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আওয়ামী লীগ ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল। অতএব এভাবে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং সেটিই হয়। এক পর্যায়ে অন্যান্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করার (১৩ই মে ১৯৫৪) পূর্বে হক সাহেব তাঁর এক ভাগিনেকে আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ থেকে অন্যরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে সম্মত হন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬২)।

একইভাবে, বঙ্গবন্ধুরও মানিক মিয়ার ওপর এক ধরনের ব্যক্তিগত অধিকার বা দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা নানা ঘটনা থেকে জানা যায়। ১৯৫২ সালের শেষের দিকে গণচীনে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করা উপলক্ষে ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটে, যা বঙ্গবন্ধু তাঁর *আত্মজীবনী*তে সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। পূর্ব বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধুসহ পাঁচজন প্রতিনিধি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মানিক মিয়াও ছিলেন। তিনি যাওয়া না-যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন এবং এক পর্যায়ে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু

বঙ্গবন্ধুর পীড়াপীড়ির কারণে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। সমগ্র ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু তাঁর বইতে এভাবে বর্ণনা করেন:

> আওয়ামী লীগ অফিস হয়ে মানিক ভাইয়ের কাছে *ইত্তেফাক* অফিসে চললাম। মানিক ভাইকে অনেক করে বললাম, একটু একটু করে রাজি হলেন, তবে ঠিক করে বলতে পারছেন না। ... মানিক ভাইকে নিয়ে বিপদ! ... সকালে প্রস্তুত হয়ে আমি মানিক ভাইয়ের বাড়িতে চললাম। ... সকাল আটটায় যেয়ে দেখি তিনি আরামে শুয়ে আছেন। অনেক ডাকাডাকি করে তুললাম। আমাকে বলেন, "কি করে যাব, যাওয়া হবে না, আপনারাই বেড়িয়ে আসেন।" আমি রাগ করে উঠলাম। ভাবীকে বললাম, "আপনি কেন যেতে বলেন না, দশ-পনের দিনে কি অসুবিধা হবে? মানিক ভাই লেখক, তিনি গেলে নতুন চীনের কথা লিখতে পারবেন, দেশের লোক জানতে পারবে। কাপড় কোথায়? সুটকেস ঠিক করেন। আপনি প্রস্তুত হয়ে নেন। আপনি না গেলে আমাদের যাওয়া হবে না।" মানিক ভাই জানে যে, আমি নাছোড়বান্দা। তাই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২২২)।

তথ্যনির্দেশ

১. দেশ বিভাগের পর সোহরাওয়ার্দীকে কলকাতায় রেখে বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে ফিরে আসার সেই বিদায় মুহূর্তের অনুভূতি তিনি তাঁর বইতে এভাবে প্রকাশ করেন, "শহীদ সাহেবের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তাঁকে রেখে চলে আসতে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার মন বলছিল, কতদিন মহাত্মাজী শহীদ সাহেবকে রক্ষা করতে পারবেন? কয়েকবার তাঁর উপর আক্রমণ হয়েছে" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৮২)।